তারিখ 28 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

মাছুম বিল্লাহ ▷

শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কাটাছেঁড়ার ঝুঁকি

প্রশ্নব্যাংকের জায়গা দখল করল বাজারের নোট বই। শিক্ষার্থীদের বই পড়া, ক্লাস করা, নিজ থেকে জানার বিষয়গুলো একই থেকে গেল অর্থাৎ এগুলোর ধারেকাছে না গেলেও পাসের হারে কোনো পরিবর্তন হলো না, বরং বাড়তেই থাকল। এমসিকিউর নম্বর এখন ধীরে ধীরে কমানো শুরু হয়েছে। এমসিকিউতে ১০ থেকে ২০-এর বেশি থাকা উচিত নয়। সবশেষে বলতে চাচ্ছি, সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটিও ভালো কিছুর ইঙ্গিত বহন করে না। তাই বোধ হয় শুরু হয়েছে অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করার চেষ্টা। এটি আবার কেমন হবে, সেদিকে তাকিয়ে আছি

পঞ্চম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষার আদলে সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তিন বছর পেরোলেই শিক্ষার্থীদের আবার জেএসসি পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা পরীক্ষাভীতিতে ভুগছে। অভিভাবক ও শিক্ষাবিদরা এ দুটি পরীক্ষাকে বোঝা হিসেবে দেখছেন। শিক্ষার্থীদের মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হচ্ছে এসব পরীক্ষার কারণে; অথচ এসব পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে খুব একটা পজিটিভ প্রভাব ফেলছে না। তবে এ বয়সের শিক্ষার্থীরা ব্যস্ত থাকছে পড়ালেখা, পরীক্ষা আর বইপুস্তক নিয়ে। অনেকে হয়তো মনে করছেন যে এসব নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে এই বয়সের শিক্ষার্থীরা হয়তো বাজে কাজে মনোনিবেশ করত। কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও কো-কারিকুলার কার্যাবলিতে ব্যস্ত রাখা যেত, যা তাদের সুষম শারীরিক ও মানসিক গঠন ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করত, এ বিষয়টি আমরা গুরুত্বও দিচ্ছি না, খেয়ালও করছি না।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছেই। একের পর এক চালু করা হচ্ছে নতুন পদ্ধতি। একটি চালুর পর শুরুতে সেটি সাধুবাদ পেলেও কিছুদিন যেতে না যেতেই ধরা পড়ে নানা অসংগতি। সে অবস্থায় ওই পদ্ধতি টেনেহিঁচড়ে পাঁচ-সাত বছর ধরে চালু রাখা হয়। সমালোচনার মাত্রা বাড়লে একপর্যায়ে সেটি বাতিল করা হয়। আবার চালু করা হয় নতুন পদ্ধতি। অথচ এর আগে এ ব্যাপারে যথাযথ যাচাই-বাছাই হয় না। থাকে না দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা। ফলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা পড়েন দ্বিধাদ্বন্দ্বে। পুরনো পদ্ধতিতে মানিয়ে নেওয়ার আগেই মুখোমুখি করা হয় নতুন আরেক পদ্ধতির। বিপাকে পড়েন শিক্ষকরাও। বেশির ভাগ শিক্ষক দক্ষ না হওয়ায় তাঁরা নিত্যনতুন পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন না। এতে আপাতদৃষ্টিতে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পাসের হার না কমলেও চূড়ান্তভাবে প্রভাব পড়ছে শিক্ষার মানে। এটি অস্বীকার করা যাবে না কোনোমতেই। ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতিতে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়; অথচ এরপর ছয় বছর এ নিয়ে বলা যায় খুব একটা কাজ হয়নি। এ অবস্থায় গত মে মাসে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করা হলো, যদিও ২০১৩ সালে ৫৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। পর্যায়ক্রমে সেগুলোতে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি খোলা হয়েছে। এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে তাদের কার্যক্রম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষায় আমরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আগপিছু বিবেচনা না করেই আমরা পরিকল্পনা করছি। শিক্ষানীতি ২০১০ অত্যন্ত ভালো। কিন্তু এর বাস্তবায়ন ধাপে ধাপে হওয়া উচিত। ২০১০ সালের পর থেকেই যদি প্রাথমিক অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতের কাজ শুরু হতো, তাহলে আজ এসব কথা উঠত না। আবার কথা নেই, বার্তা নেই প্রাথমিক সমাপনী চালু হয়ে গেল। আসলে আমরা ওপরে ওঠার জন্য মই নিয়ে আসছি, তাতে ধাপগুলো অনুপস্থিত।' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ বলেন, 'আমাদের নীতিনির্ধারকদের দুটি সমস্যা। প্রথমত, তাঁরা কারিকুলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ নয়। যেকোনো বিষয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হলেও এ দেশে তা করা হয় না। আবার কর্তাব্যক্তিরা বাইরের দেশ থেকে একটা কিছু দেখে এসেই তা চালু করে দেন। অর্থাৎ তাঁদের মাথা থেকে বেরোলেই তা চাপিয়ে দেন। যখন যিনি দায়িত্বে আসেন তিনিই নতুন কিছু করতে চান, কৃতিত্ব নিতে চান। কিন্তু তা বাস্তবসম্মত কি না তা চিন্তা করেন না।' বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপদ্ধতি দেখতে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে সরকারিভাবে প্রায় ৩০০ সরকারি কর্মকর্তা বিদেশ সফরে যান। বিশেষ করে সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস অ্যানহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট, টিচার্স কোয়ালিটি ইমপ্রুফমেন্ট প্রজেক্ট, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম ও হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যানহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের অধীনেই এসব সফর হয়। সফরগুলোতে একই লোক বারবার বিদেশে যাচ্ছেন। শিক্ষা খাতের বাইরের লোকও যাচ্ছেন। ফলে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়নে তেমন কাজে লাগছে না এসব বিদেশ সফর। এ সফরগুলো হচ্ছে নিতান্তই আনন্দভ্রমণ।

১৯৯১ সালে মাধ্যমিকে চালু করা হয় ৫০ নম্বরের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন। এ জন্য প্রতি বিষয়ে ৫০০টি এমসিকিউ প্রশ্ন নির্ধারণ করে দেওয়া হতো। তার নাম দেওয়া হয়েছিল প্রশ্নব্যাংক। বাকি ৫০ ছিল লিখিত পরীক্ষা। শিক্ষার্থীরা এমসিকিউ ও লিখিত মিলিয়ে ৩৩ পেলেই পাস করে যেত। শিক্ষার্থীরা ৫০০ এমসিকিউ প্রশ্ন মুখস্থ করেই পাস করে যেত, এতে পাসের হার রাতারাতি বাড়লেও মান যে কী হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। আর এটি কেন করা হয়েছিল? বিদেশি শিক্ষার অনুকরণে। অনেক দেশে এমসিকিউ চালু আছে, তাই আমাদের কর্তাব্যক্তিরা বিদেশের এমসিকিউ দেখে এসে চালু করে দিলেন এমসিকিউ। স্থান-কাল-পাত্র, পারিপার্শ্বিকতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় না নিয়েই চালু করা হলো এমসিকিউ। ফলও পাওয়া গেল। বই টাচ না করে, ক্লাস না করে পরীক্ষার্থীদের পাসের হার হু হু করে বাড়তে থাকল। আর তাতেই আমাদের কর্তাব্যক্তিরা খুশি হতে থাকলেন এবং ক্রেডিট নেওয়া শুরু করলেন। উল্লেখ্য, এভাবে পাস করে আসা শত শত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকতা পেশায় ঢুকে পড়েছেন। এখন তাঁরা কিভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করবেন আর কিভাবেই বা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বানাবেন? কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে এবং শিক্ষাবিদদের চাপাচাপির ফলে ১৯৯৬ সালে তথাকথিত প্রশ্নব্যাংক তুলে দেন। কিন্তু এমসিকিউ পদ্ধতির প্রশ্ন চলতেই থাকে। প্রশ্নব্যাংকের জায়গা দখল করল বাজারের নোট বই। শিক্ষার্থীদের বইপড়া, ক্লাস করা, নিজ থেকে জানার বিষয়গুলো একই থেকে গেল অর্থাৎ এগুলোর ধারেকাছে না গেলেও পাসের হারে কোনো পরিবর্তন হলো না। বরং বাড়তেই থাকল। এমসিকিউর নম্বর এখন ধীরে ধীরে কমানো শুরু হয়েছে। এমসিকিউতে ১০ থেকে ২০-এর বেশি থাকা উচিত নয়। সবশেষে বলতে চাচ্ছি, সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটিও ভালো কিছুর ইঙ্গিত বহন করে না। তাই বোধ হয় শুরু হয়েছে অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করার চেষ্টা। এটি আবার কেমন হবে, সেদিকে তাকিয়ে আছি।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত এবং
সাবেক ক্যাডেট কলেজ শিক্ষক
masumbillah65@gmail.com